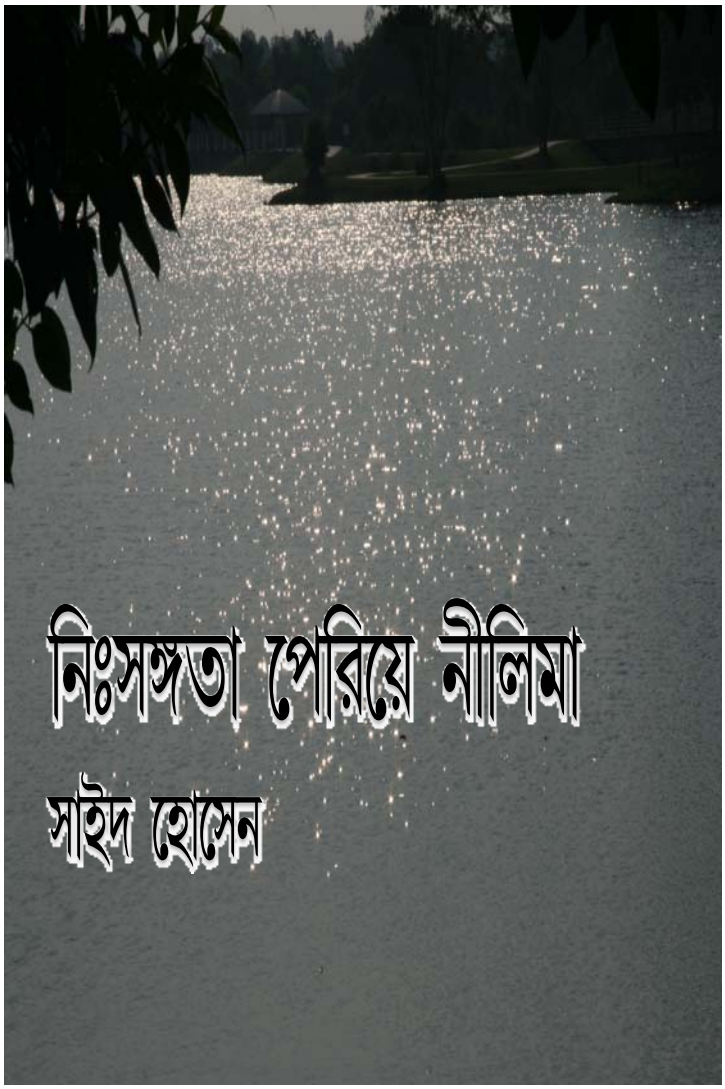
নিঃসঙ্গতা পেরিয়ে নীলিমা
সাইদ হোসেন

নিঃসঙ্গতা পেরিয়ে নীলিমা

***

সাইদ হোসেন

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট, ২০০৮

Date of first edition publication: March 14, 2008

© সাইদ হোসেন কতৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

© Published by Sayed Hossain

Contact Address:

Sayed Hossain
Faculty of Management
Multimedia University
63100 Cyberjaya, Malaysia
E-mail: sayed.hossain@yahoo.com

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

©Sayed Hossain 2008

প্রচ্ছদ এবং অলংকরণে : সাইদ হোসেন

ISBN No. 978-983-43934-4-1

** The ISBN number is provided by the National Library of Malaysia.

© Neeshshongota Pereye Nilima, A Bengali novel written by Sayed Hossain.

।। প্রথম অধ্যায় ।।

শীতের সকাল

ঘড়ির রিং টন টা অনবরত বেজে চলেছে । সকাল আটটার ঘন্টি দিলো । অলস হাতটা বাড়িয়ে ওটাকে থামিয়ে দিয়েছি । অনেক আপত্তি নিয়ে ঘড়িটা থেমে গেল ঘড় ঘড় শব্দে । মনে হলো আরো কিছুক্ষণ বাজতে পারলে ও শান্তি পেতো । কিন্তু ওকে শান্তি দিতে গেলে আমার অশান্তির শেষ থাকে না, তাই ওকে থামাতে হলো ।

ঘড়িটা আবার বাজবে আগামী কাল সকালে । তখন ওকে থামাবো, না নিজেই বিছানা ছেড়ে জামা-কাপড় পড়ে রেডি হবো, সেটা নির্ভর করছে আমার অফিসের উপর । যেদিন অফিস থাকে, সেদিন ঘন্টিটা আমায় কান ধরে তুলে দেয় । অন্যথায় ঘড়ির উপর অলস হাতটা এসে পড়ে । ঘড় ঘড় শব্দে থেমে যায় ও ।

ঘন্টিটা বাজতেই ওকে থামিয়ে দিলাম তারপর কাত হয়ে পাশ ফিরে শুয়েছি । লেপটা ভাল মত চাপিয়ে নিয়েছি যেন শীতের কণিকা লেপের লোমকুপ ভেদ করে ভেতরে না ঢুকে পড়ে । তারপরেও শীতের আচর লাগছে গায়ে । ছোট্র এই নারায়নগন্জ শহরে শীতের আলাদা একটা আমেজ আছে । কেমন যেন ঝির ঝির শব্দে কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ে চারিপাশে । খুব কাছের মানুষ ঠিক মতন চেনা যায় না । কুয়াশায় কুয়াশায় ঢেকে যায় সারাটা শহর ।

গতরাতে ঘুমোনোর সময় জানালাটা শক্ত করে চাপিয়ে শুয়েছি কিন্তু উপরে থাকা বেলকনির ফুটো দিয়ে হিম-শীতল কুয়াশা ঢুকে পড়ছে । পৃথিবীতে যত ক্রাইম হয়েছে, তার একটা বড় অংশ হয়েছে এই বেলকনি দিয়ে । এর একটা কারণ হলো, একটা বাড়ির বেলকনি হলো সবচেয়ে দূর্বল যায়গা । বেলকনী ভেঙে অনায়েসে ঢুকে পড়া যায় ।

ঢাকা থেকে বদলি হয়ে নারায়নগন্জ এসেছি কিছুদিন হলো । প্রাইভেট ব্যাংকে চাকরি । শহরের মাঝে চাষাড়ার শেষ প্রান্তে ব্যাংকটা । ছিমছাম এয়ারকুলারে মুড়ানো, সকাল-বিকেল খদ্দেরে ভরে থাকে । আমি ক্রেডিট সেকশনের দায়িত্বে আছি । ব্যবসায়ীদের বুঝে শুনে ধার দেয়াটা আমার কাজ ।

শীতলক্ষা লাগোয়া আমাদের ব্যাংকের কোয়ার্টার । সেখানে অনেক কষ্টে নাম লিখিয়েছি । তিন রুমের বাড়ি, দুইটা বেড রুম, সামনে এক ফালি বসবার ঘর । এদিকে মাঝারি সাইজের কিচেন, দক্ষিণে লম্বা বারান্দা । বারান্দায় কোন ছাদ নেই । খোলা আকাশের নিচে ঝুলে আছে বারান্দাটা । এখানে দাঁড়ালে সারাটা আকাশ সামনে চলে আসে । এই বারান্দায় বসে কত যে ছুটি-ছাটার রাত কাটিয়েছি, তার ইয়াত্তা নেই । এই বারান্দাটাই বাড়ির সৌন্দর্য । দিনের বেলায়, দুরে, ঐ দুরে গ্রামের সবুজ অরণ্য চোখে পড়ে । নাকে এসে ভর করে রৌদ্রুর মিষ্টি গন্ধ । শীতের সকালের রৌদ্রু সারা গায়ে পরশ বুলিয়ে যায় । তারপর দিন পেরিয়ে রাত নামে, হাজারো নক্ষত্রে ভরে যায় আকাশটা । আকাশের নীলিমায় বিছিয়ে থাকা হাজারো নক্ষত্র থিক-থিক করে জ্বলতে থাকে । তখন মনে হয়, আগে থেকে কেউ যেন আকাশের নীলিমায় নক্ষত্রের মালা বিছিয়ে রেখেছিলো ।

আমার ফ্ল্যাটটা পড়েছে চার তলায় । প্রতিদিন সিড়ি মাড়িয়ে চার-তলায় উঠি আবার নেমে আসি অফিসের সময় গুলোতে । পুরো বাড়িটাই শীতলক্ষার ঢালে বানানো । নদীর শীতল হাওয়া সারারাত আমাকে ছুঁয়ে ফেরে । মাঝে মাঝে নদী থেকে জাহাজের সার্চ লাইট এসে পড়ে আমার জানালায় । তখন জানালা ধরে তাকিয়ে থাকি যতক্ষণ না পর্যন্ত সার্চ লাইটের বাতি মিলিয়ে না যায় ।

হাত বাড়িয়ে খাটের পাশ থেকে পানির গ্লাসটা টেনে নিলাম । দুই ঢোক খেয়ে আবার শুয়ে পড়েছি । আজ আর উঠছি না, সারাদিন শুয়ে কাটাবো । তাকিয়ে দেখলাম ঘরের জানালা গলিয়ে সকালের আলো এসে পড়ছে । কিছুক্ষণ হলো সূর্য উঠেছে আর সেই আলোর লালচে আভা ছড়িয়ে পড়ছে আমার মেঝেতে । আমার হাতের উপরে সেই আলোর আভাটা ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠলো । সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম । ভেবে দেখলাম, সেই কত দূরে থাকা সূয্যি মামা ঠিক ঠিক আমাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে ।

নিজেকে অনেক বুঝিয়ে উঠে বসলাম । টয়লেটে না গেলেই না । টয়লেট সেরে হাত পা মুছে নিয়েছি । ফজরের নামাজটা পড়া হয়নি । সকালের নামাজ পড়তে প্রায় দেরি হয়ে যায় । এ এক অলসতা । শুনেছি ফজরের ওয়াক্তে খুদা প্রথম আসমানে নেমে আসেন ।

নামাজটা সেরে নিলাম । খুদার কাছে চাইতে নিয়ে চাইলাম না । খুদার কাছে চাইবার কি আছে ? তার তো অজানা কিছু নেই । আমাদের চাওয়া পাওয়া সবই তার জানা । এই বিশ্বের চারিপাশ ঘিরে যা কিছু, সবই তার সেজদায় অবনত । প্রবল পরাক্রান্ত অসীম শক্তিধর এক পরম মানব । সেই শক্তিধর মানুষটি আমাদের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় । মনে হতেই কেমন শিরশির করে উঠলো শরীরটা । সেই শিরশিরটা অনেকক্ষণ রইলো । তারপর উঠে গিয়ে সেলফের পাশে বসেছি । নানা রংয়ের বইয়ে শেলফটা থাসা । কি সুন্দর হলদে, নীল, সবুজ মলাটের বইগুলো । সারি সারি ভাবে সাজানো আছে । নাস্তা খাবো না আবার শুয়ে থাকবো, সে দ্বন্দে ভুগছি । একদম রান্না ঘরে যেতে মন চাইছে না । আবার শুয়ে পড়লাম । আজ আর কাল ছুটি তাই দেরিতে নাস্তা করলে অসুবিধে নেই । লেপ কাথা মুড়িয়ে আলু থালু হয়ে আবার শুয়ে পড়েছি । বাবা মার কথা মনে পড়লো । কি করছে ওরা এখন ?

বাবা-মা থাকেন ঢাকায় । জিগাতলায় আমাদের বাসা । বাবা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে একাউন্টেন্ট ছিলেন । এখন রিটিয়ার করে ঘরে থাকেন । মা কিছু করেন না । ঘরে বসে স্বামি আর আমাকে সামাল দেন । ওরা খুব সুখী । বাবা মার সুখ দেখলে আমার মন ভরে যায় ।

মাঝে মাঝে বাবা-মা এসে হাজির হয় আমার নারায়নগন্জের বাসায় । মা বলে, বাবু, আমরা কদিন তোর সাথে থাকবো ।

বেশ তো । কদিন কেনো ? সব সময়ের জন্য থাকো ।

- না বাবু । জিগাতলার বাড়ি ফেলে এসেছি, গাছ গুলোকে কে দেখবে ? তাছাড়া তোর দাদা একা । আমরা না থাকলে উনার কষ্ট হয় । কদিন থেকে আমরা ফিরে যাব তারপর আবার আসবো ।

- ঠিক আছে, আমি হেসে বলি ।

জিগাতলার বাড়িতে আছে বিশাল বাগান । সারাটা উঠোন আর ছাদ জুড়ে আছে এই বাগান । কি কি পদের গাছ আছে, তার একটা লিস্ট করা হয়েছে । সেই লিস্টটা আমার দাদা মেনটেইন করেন । যখনি কোন নূতন গাছ এলো, দাদা টুকে রাখেন খাতায় । গাছের নাম, বয়স, বৈশিষ্ট সব লেখা আছে এই খাতায় । খাতাটা সবুজ রংয়ের বলে ওর নাম সবুজ খাতা । সব সময় সেটা দাদার কাছে কাছে থাকে । কোথাও গেলে দাদা সাথে নিয়ে যান । যতবারি দাদা আমার এখানে এসছে, সেই সবুজ খাতাটা দেখেছি । চায়ের টেবিলে বা অবসর সময়ে সেই খাতাট খুলে দেখেন তারপর গবেষণা করেন সে গুলো নিয়ে ।

জিগাতলার বাড়ির গাছ গুলো সুন্দর সারিবদ্ধভাবে সাজানো । দেখলেই বোঝা যায় এগুলো যত্ন পায় । বাগানের ফাঁকে ফাঁকে মাচা করা হয়েছে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে । সেই মাচা বেয়ে লতাপাতা গড়িয়ে চলে । বাগানে পাতা বাহাড়ের গাছ আছে দশ-বারো পদের । গত বছর থাইল্যান্ড থেকে বেশ কিছু এনেছে বাবা । মালয়শিয়ার কিছু গাছও আছে ওদের বহরে । বেশ কয়েকটা এরি মধ্যে মরে গেছে প্রতিকূল আবহাওরা জন্য । আবার অনেকে ফুল দেয় । বংশ বৃদ্ধি হয়েছে অনেকের । ফুলে ফুলে ভরে আছে বাগানটা ।

মা জিজ্ঞেস করে,

বাবু, তোর একা একা ভয় লাগে না ? তোকে বিয়ে করাবো, ফুটফুটে বউ নিয়ে আসবো ঘরে । সেই ঘর বাড়ি গুছিয়ে রাখবে, তোকে পাহাড়া দেবে । দেখবি আর ভয় লাগবে না ।

আমি কিছু বললাম না । চুপ হয়ে গেলাম ।

মা বললেন, তুই যে কথা বলছিস না ? বিয়ের কথা বললেই মুখ ঘুরিয়ে নিস । কি ব্যাপার বলতো ?

আমি বললাম,

ভয় করবে কেন মা ? এটা তো একটা শহর । হাজার হাজার মানুষ বাস করে এই শহরে । নিচ তলায় জাফর সাহেব থাকেন পরিবার নিয়ে । ঐ যে দুরে সিকিউরিটি অফিস । প্রতিদিন ওরা টহল দেয় । তুমি মিছে মিছি ভয় পাচ্ছো ।

আমার মা চুপ হয়ে গেলেন । তারপর বললেন, বাবু, শুন ।

- বলো ।

- ঢাকায় বদলি হয়ে আসা যায় না ? তাহলে না হয় আমরা সবাই এক সাথে রইলাম ।

আমি বললাম,

ওদের এখন পোস্ট খালি নেই । পোস্ট খালি হলে এ্যাপলাই করবো তারপর চলে আসবো তোমাদের ওখানে । দাদা, আমি, তুমি, আর বাবা এক সাথে থাকবো ।

- আর তোর লাল টুকটুকে বউ, এই বলে মা হেসে দিলেন । অনেকক্ষণ হাসলেন মা । মা যে অনেক সুখী, সেটা ওর হাসিতে ফুটে উঠলো ।

পৃথিবীতে সুখী মানুষ কারা এ প্রশ্নের জবাব দেয়াটা দুরুহ । তবে আমার মা যে সুখী, সেটা বলে দেয়া যায় । মার কথা, মার হাসি সব কিছুতেই সুখ উপচে পড়ে । আমার মা কাউকে আঘাত করে কথা বলেন না । তাই বুঝি খুদা তার জীবনে কোন আঘাত দেননি ।

বাবা এসে বললেন, বাবু, তোদের এই দিকটা কিন্তু খুব পরিষ্কার । ঢাকাতে এমন পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যায় না ।

- তাহলে যাবে কেন ? এখানে থেকে যাও ।

বাবা হেসে বললেন,

এখানে থেকে গেলে বাড়ির গাছগুলোকে দেখবে ? আমরা না দেখলে ও গুলো মরে ভুত হয়ে যাবে । আর গাছ গুলো মরে গেলে, তোর দাদাও মরে যাবেন ।

আমি আর কিছু বললাম না । চুপ হয়ে রইলাম ।

বাবা বললেন, সব চেয়ে ভাল লাগে, যখন দেখি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি তোর বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যায় । কই যায় ওরা ?

- কিছুটা গেলেই তো বুনোভূমি, বিল আর জলা জংগল । ওখানে থাকে ওরা । দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় । মাঝে মাঝে আমার কার্নিশে বসে ঝাঁক বেঁধে ।

- তুই খাবার দিস না ?

- দেই, এই বলে খুদের বাটিটা মেলে ধরলাম ।

বাবা খুশি হয়ে গেলেন । হেসে ফেললেন আমার বাবা ।

বাবার চেহারাটা ঠিক আগের মতনি আছে । দুই একটা পাকা চুল ছাড়া বাবার কোন পরিবর্তন নেই । হাসিতে হাসিতে ভরে থাকে মুখটা । বরং মার চেহারায় কিছু পরিবর্তন এসেছে । আগের মতন নেই । কেমন শুকিয়ে গেছে আমার মা । তারপরেও বাবা-মার মধ্যে অনেক আন্ডারস্ট্যানডিং । কেউ কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলে না । ঝগড়া লাগলে দুজনে চুপ করে বসে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা । তারপর সময় গেলে আপনাতেই ঠিক হয়ে যায় । আবার দুজন হেসে উঠে ।

বাবা মার মধ্যে ঝগড়া বাধলে দাদা এসে ঠিক করে দেয় । দাদার এই কাজটার জন্য বাবা-মার অভিমানের সময়টা স্বল্প হয়ে আসে ।

দাদা এসে বলে, বউ ।

- বাবা, মা জবাব দেয় ।

- এদিকে আসো তো ।

মা এসে দাঁড়ায় ।

- চলো একটু বের হই । তুমি রেডি হয়ে আসো ।

- ঠিক আছে । দশ মিনিটের মধ্যে আসছি ।

মা কে নিয়ে বের হয় দাদা । দাদার প্রকান্ড গাড়িটা হেলে দুলে রাস্তায় নেমে আসে ।

দাদা বলে, চলো বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাই । নূতন গাছ এসেছে ।

মা খুশি হয়ে যায় । চলেন বাবা ।

দাদা বললেন,

ভারতের কিছু গাছ আছে চার-পাঁচ ফুটের বেশি উঁচু হয় না কিন্তু পাশে বাড়ে । লতা, পাতা, কান্ড, ছড়িয়ে পড়ে পাশের দিকে । এ ছাড়া মায়ানমারের পাহাড়ী গাছ এনেছে ওরা ।

মা বলেন, এ গুলো এনে বুনবেন কোথায় ?

- দক্ষিণের কোণাটা তো ফাঁকা করেছি । ওখানে বুনে দেবো ।

- ঠিক আছে । দক্ষিণের কোণায় খারাপ হবে না ।

- তোমার কি কোন চয়েস আছে ?

মা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ তারপর বললো, দক্ষিণের কোণাটা ভালো তবে পশ্চিমের ঢালে বুনলে খারাপ হতো না কারণ আলো হাওয়া ওখানেই সব চেয়ে বেশি ।

- ঠিক আছে । পশ্চিমেই বুনবো ।

মা খুশি হয়ে গেলেন । হেসে দেন আমার মা ।

ছোট্ট ভ্যানে করে গাছটা নিয়ে আসা হয়েছে । প্রায় চার ফুট উঁচু গাছটা । এখন তোড়জোড় চলছে বুনে দেবার জন্য । করিম মিয়া গর্ত করেছে । এক ফুট গভীরতা, প্রস্থ হাফ ফুট । বাগানের মাটি খুরতেই মাটির আঁশটে গন্ধ নাকে এলো । কেমন যেন শ্যাত শ্যাতে ভাব । সার, পানি, ঔষধ সবই এনে রাখা হয়েছে ।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে গাছটা দাঁড়িয়ে গেল পশ্চিমের কোণায় । বাবা-মা-দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন । মাঝে মাঝে বাবা নেমে যাচ্ছে করিম ভাইয়ের সাথে । আলতো করে মাটি বুজিয়ে দেয়া হলো । গাছটা দাঁড়িয়ে গেছে সুন্দর করে । সবুজ খাতায় উঠে এলো নূতন অতিথির নাম ।

গাছটা বুনে ওরা ঘরে ফিরে এসেছে । তখন বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে । মা এসে বললো, তোমাকে চা দেবো ?

- দাও ।

চা, বিস্কুট এনে টেবিল সাজিয়েছে আমার মা । দাদা এসে বসলেন । চা খেতে বসলো ওরা । বিস্কুটের প্যাকেট খুলে দিলো মা । চা ঢেলে দিলেন বাবা, দাদার কাপে ।

- বাবা একটু চিনি দেব ?

- দাও ।

আমার মা চিনি ঢেলে দিলেন দাদার কাপে ।

- যে গাছটা আজ লাগালাম, ওর একটা নাম দিলে ভাল হয় ।

- কি নাম দিতে চান বাবা ?

- তুমি ঠিক করো ।

মা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললো, যেহেতু গাছটা ভারত থেকে এসছে, ওর নাম দিলাম পলাশী ।

- ঠিক আছে, তাই হবে, এই বলে দাদা নামটা টুকে নিলেন সবুজ খাতায় ।

বাবা-মা আর দাদা । ওদের এক জায়গায় ভীষণ মিল । গাছকে ওরা ভালোবাসে । গাছের যত্ন আর সেবা দিতে কখনো পিছপা হয় না ওরা । যতবারি ওরা আমার এখানে এসেছে, কখন ফিরে যাবে তাই নিয়ে ওদের ব্যস্ততা । গাছ ছাড়া থাকতে পারে না । না পারে আমাকে ছেড়ে থাকতে, না গাছ । আমার কথা মনে হলে ছুটে আসে আবার ফিরে যায় তাড়াহুড়া করে গাছের বাড়িতে ।

On line publication at URL: www.sayedhossain.com

।। দ্বীতিয় অধ্যায় ।।

কনফারেন্স

সকাল থেকে শুরু হয়েছে ব্যাংকারদের কনফারেন্স । নারায়নগন্জ শহরের এক প্রান্তে বসেছে এই আন্চলিক কনফারেন্স । বিষয়: সুদের হারের ব্যবস্থাপনা ।

সকাল সকাল নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম । স্থানীয় একটা হোটেল ভাড়া করা হয়েছে এই সন্মেলনের জন্য । ঢাকা থাকে সাংবাদিক এসেছে । টিভি চ্যানেল, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার লোকজন এসে হাজির । সকালে থেকে শুরু হয়েছে ওদের তোড়জোড় ।

পনের মিনিটের মাথায় হোটেলে পৌছালাম । হোটেলের লবি পেরিয়ে মস্ত হল ঘর, এই ঘরেই আয়োজন হয়েছে সন্মেলনের । গিয়ে দেখি মস্ত হলটা কানায় কানায় ভরে আছে । কোথাও কোন বসার জায়গা নেই । সামনের সারিতে একটি সিট খালি আছে কিন্তু তার পাশে এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন । বসবো কি বসবো না ইতস্তত করছি ।

সম্মেলনের উদোক্তারা এগিয়ে এসে বললো, সামনের এই একটি সিট খালি আছে । আপার পাশে একটু বসতে হবে ।
আমি গিয়ে বসলাম ভদ্রমহিলার পাশে তারপর বললাম, কিছু মনে নেবেন না । ঐ দিকটাতে একদম জায়গা নেই ।
মেয়েটা হেসে বললো, কোন অসুবিধে দেখছি না । আপনি বসুন ।

আমি কাচুমাচু হয়ে বসে পড়লাম । আমাকে জড়সড় হয়ে বসতে থাকতে দেখে মেয়েটা বললো, আপনার তো কোন অসুবিধে হচ্ছে না ?
আমি হেসে বললাম, কৈ না তো ? এই দেখুন কেমন আরামে বসেছি ।
মেয়েটা বললো, আপনি কোন ব্যাংকে থেকে এসেছেন ?

- ওয়ান ব্যাংক । বড় রাস্তার উপরে ব্যাংকটা । আপনি ?

- ওয়াশা ব্যাংক । আপনার ব্যাংক থেকে দশ মিনিটের পথ, এই বলে মেয়েটা চুপ হয়ে গেল । তারপর বললো, আজ তো ব্যাংকের সুদ নিয়ে আলোচনা হবে । আপনি কি কোন প্রশ্ন করবেন প্রশ্ন-উত্তর পর্বে ?

বিনয়ের হাসি দিয়ে বললাম,

সে ধরনের কোন প্ল্যান নেই । সম্মেলন শেষে ফিরে যাব । আপনি কোন প্রশ্ন রাখছেন ?

- দেখি । রাখতেও পারি কারণ এ সুদের ব্যাপারটা আমাকে তাড়িয়ে ফেরে । সুদ নিয়ে আলোচনা উঠলে আমি কথা না বলে পারি না ।

আমি হেসে বললাম, এই কৌতুহলের কারণ কি ?

- এই সুদের ব্যাপারটা এমন একটা ব্যাপার যা আমাদের পুরো অর্থনীতিকে তাড়িয়ে ফেরে । এই সুদের হার নির্ধারনে কোন ভুল হলে পুরো অর্থনীতিতে দোদুল্য শুরু হয়ে যাবে । তারপর একটু থেমে বললো, এ সুদ নিয়ে আমি আর কি বলবো । আপনি ঢের ঢের ভাল জানেন ।

আমি হেসে বললাম,

আপনি যতটা বলছেন ততটা নয় । ব্যাংকের কাজের জন্য যতটুকু জানবার দরকার, ততটকুই আমার দৌড় ।

মেয়েটি বললো, আপনি ব্যাংকের কোন সেকশনে কাজ করেন ?

- ক্রেডিট সেকশনে । ব্যবসায়ীদের ধার দেয়াটাই আমার কাজ ।

- তাহলে তো সুদের ব্যাপারটা আপনার খুব জরুরি ?

- ঠিক তাই, এই বলে আমি হেসে দিলাম । তারপর বললাম, আপনার পরিচয় জানতে পারি ?

- আমি অনুষা । অনুষা রায়হান । ওয়াশা ব্যংকের নারায়নগন্জ শাখার ম্যনেজার । আপনি ?

- আমি হাসিব খন্দকার । ওয়ান ব্যংকে সেকেন্ড অফিসার । একটু থেমে বললাম, আপনি মনে হয় লেখালেখি করেন ?

- ঠিক ধরেছেন । কিভাবে জানলেন ?

আমি বললাম,

সাপ্তাহিক ব্যাংকিং এবং অর্থনীতিতে আপনার লেখা প্রায় বের হয় । আমি তো পড়ি আপনার লেখা । সাজিয়ে লিখতে পারেন ব্যাংকিং এর ব্যাপারগুলো ।

অনুষা খুশি হয়ে গেল । বললো, আমার কোন কোন লেখা পড়েছেন ?

- অনেকগুলো পড়েছি তবে ব্যাংকের সুদ নিয়ে আপনার অনেক লেখা পড়েছি । সম্ভবত, আপনি সুদের হার নিয়ে গবেষণা করেন ।

- ঠিক তাই, এই বলে অনুষা হেসে দিল । আমানতের উপর সুদ, ঋণের উপর সুদ ঠিক কতটা হতে পারে বা হওয়া উচিত, সেইটে নিয়ে আমার গবেষণা ।

- বাইরে পড়তে যাবেন নাকি ?

অনুষা হেসে বললো, পড়ে এসেছি অলরেডি ।

- কোথায় পড়লেন ?

- ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতিতে মাস্টার্স করেছি । এই মাস্টার্স করতে গিয়ে সুদের হারের উপর থিসিস লিখেছি ।

আমি বললাম, এ যে বিরাট ব্যাপার । আপনি লাকি, কত তাড়াতাড়ি পড়াশুনাটা সেরে ফেলেছেন ।

- হু । বলতে পারেন । আমার লাক সত্যি আমাকে ফেবার করেছে । GRE তে কিভাবে যেন ভাল করে ফেললাম । জুটে গেল এ্যাসিসট্যান্টশিপটা । পাড়ি দিলাম ক্যালিফোর্নিয়াতে ।

- স্কলারশিপ না পেলেও তো যেতে পারতেন?

- বাবা মার কাছে ধার নিতে ভাল লাগে না এই বয়সে । নিজের চেষ্টায় যেটুকু করা যায় । আপনি?

আমি বললাম,

সে রকম সুযোগ হয়নি তবে চেষ্টা করছি । বৃত্তি পেলে যাব । তবে GRE তে ভাল স্কোর তুলে যাব, সে আমার দ্বারা হবে না কারণ আমি ইংরেজীতে কাঁচা ।

অনুষা হেসে বললো,

এদেশের সবাই কম বেশি ইংরাজীতে কাঁচা কিন্তু একটু চেষ্টা করলে দেখবেন কেমন সুন্দর ইংরেজী বলতে পারছেন ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

- আপনার সাবজেক্ট কি ছিল মিস অনুষা ?

- অর্থনীতি নিয়ে পড়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তারপর ব্যাংকে ঢুকে পড়ি । সেই থেকে ব্যংকে আছি । মাঝে অবশ্য দুবছরের জন্য আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিলাম, সে কথা তো আপনাকে বলেছি ।

- শিক্ষকতায় যেতে চান না ?

- হু । সে সুযোগ ছিল কিন্তু আমি চাইছি অর্থনীতিকে খুব কাছ থেকে দেখতে । তাই ব্যাংকে জড়িয়ে গেছি । তবে শেষ বয়সে শিক্ষকতায় ঢোকার ইচ্ছে আছে ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না । চুপ হয়ে বসে রইলাম ।

দেখতে দেখতে সন্মেলন শুরু হলো । স্টেজে বেশ কয়েকজন বসে আছেন । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপমন্ত্রী এসেছেন ঢাকা থেকে । উপমন্ত্রী সাহেবের বক্তব্য দিয়ে শুরু হল বক্তৃতার পালা । সুদ ব্যবস্থাপনার উপর ত্রিশ মিনিট বললেন মন্ত্রী সাহেব । প্রথমেই বলে নিলেন যে তিনি সুদের বিশেষঙ নন তারপরেও চেষ্টা করবেন এ নিয়ে কিছু বলবার । তবে সব মিলিয়ে মন্ত্রী সাহেব ভালই বললেন । লম্বা এক পরস্ত হাততালিও পেলেন তিনি । এর পরে আরো একজন ব্যাংকার বলতে শুরু করলো । আমানতের সুদের হার আর ঋণের সুদের হারের মধ্যে কেন পার্থক্য বাড়ছে সে নিয়ে কিছু বললেন । আরেকজন বক্তা ইসলামের আলোকে সুদ নিয়ে আলোচনা শুরু করলো । অনেকক্ষণ ধরে বললো ভদ্রলোক । ভালই লাগছিলো ভদ্রলোকের আলোচনা । অনেক সুন্দর করে সাজিয়ে বলছে ভদ্রলোক । বোঝা গেল অনেক পড়াশুনা করে লেকচার নোট সাজিয়েছে । সব মিলিয়ে আলোচনা জমে উঠলো । আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম আনুষা রায়হান গভীর মনোযোগ দিয়ে আলোচনা শুনছে । একটা কথা জিঙাসা করতে নিয়ে থেমে গেলাম । এরি মধ্যে অনেক কথা জিঙাসা করে ফেলেছি । বেশি কথা বলা মানুষ অনেকে পছন্দ করে না । তাই কৌতূহল দমন করে বসে রইলাম ।

দেখতে দেখতে লান্চ আওয়ার চলে এলো । আয়োজকেরা বললো, আপনারা যার যার সিটে বসে থাকুন । প্যাকেট লান্চ পৌছে যাবে । লান্চের জন্য দেড়ঘন্টা বিরতি । তারপরে শুরু হবে বিকেলের পর্ব ।

- কেমন লাগলো বলুন, অনুষা বলে উঠলো হঠাৎ করে ।

- দারুণ । খুব ইনজয় করেছি আমি ।

অনুষা হেসে দিলো । বললো, ইসলামের আলোকে সুদ নিয়ে আলোচনা টা ভাল লেগেছে । অনেক তথ্য নির্ভর লেকচার ।

- ঠিক তাই, এই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম । ভদ্রলোক কে ? আপনি চেনেন নাকি?

অনুষা বললো,

সম্ভবত উনি চট্রগ্রামে এক প্রাইভেট ব্যাংকের বড় কর্মকর্তা । কোথায় যেন দেখেছি ভদ্রলোককে । সম্ভবত আগে সরকারি ব্যাংকে ছিলেন পরে প্রাইভেটে চলে আসেন ।

- কিভাবে জানলেন?

অনুষা হেসে বললো,

সম্ভবত উনিও লেখালেখি করেন । ইসলামের সুদ নিয়ে বেশ কিছু লেখা ওর বেরিয়েছে । সেই সুবাদে ভদ্রলোককে চিনি তারপরেও ডবল চেক করে দেখবো ।

আমি বললাম,

আমার মনে পড়ছে কিছু কিছু । আমিও সম্ভবত পড়েছি ওর লেখা । আপনার মতন সাজিয়ে লিখতে পারে ।

- আপনি লিখেন না ?

আমি হেসে বললাম,

এই সব লেখালেখি আমার দ্বারা হবে না । সপ্তাহে পাঁচদিন অফিস করি আর বাকী দুদিন ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দেই । এই টুকুন বলে কথা ঘুরিয়ে বললাম, ব্যাংক ম্যানজারের চাকরি কেমন লাগছে ?

- দারুণ স্ট্রেস নিয়ে কাজ করতে হয় । ভুল হলে চাকরি তো যাবেই । জেল জরিমানাও হতে পারে তারপরেও চ্যালেন্জ নিয়ে কাজ করতে ভাল লাগে । যত স্ট্রেস তত ভাল লাগা । মনে হয় হিমালয় বেয়ে উপরে উঠছি ।

- কতদিন আর হিমালয় বেয়ে উপরে উঠবেন ?

অনুষা হেসে দিল ।

- এ কথা বলছেন কেন ? কেবল তো বছর পাঁচেক হলো চাকরি করছি । খুদা চাহেন তো সারা জীবন পার করে দেবো । তবে শেষ বয়সে ইচ্ছে আছে শিক্ষকতা করবার । আপনার দেশ কোথায় হাসিব সাহেব ?

- আমি ঢাকার ছেলে । জিগাতলায় আমার বাসা । বাবা মা আর দাদা নিয়ে আমাদের ছোট্র সংসার । সুযোগ পেলেই বাবা-মা এসে হাজির হয় । একদিন থেকে ওরা ফিরে যায় কারণ সারা বাড়ি জুড়ে আছে গাছের বাগান । গাছগুলোর অযত্ন হচ্ছে, এই ভেবে ওরা আবার ফিরে যায় ।

- আপনার কথা শুনে কেমন শীত শীত করে উঠলো ।

আমি বললাম, কেন বলুন তো ?

- ঐ যে বললেন সারা বাড়ি জুড়ে গাছ-গাছালি । যেখানেই গাছ সেখানেই ঠান্ডা, সেখানেই ভাল লাগা ।

আমি বললাম,

আমাদের বাসায় ঢুকলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন । জিগাতলার মতন ব্যস্ত জায়গায় হঠাৎ করে বন-বাদারি আপনাকে অবাক করে দেবে । মনে হবে হয়ত আপনি ঢাকা শহরে নেই । লোকালয় থেকে অনেক দূরে চলে এসেছেন ।

- আপনারা বাবা-মা আর দাদা নিশ্চয় সেই বন-বাদারিতে বসে থাকেন ঘন্টার ঘন্টা ?

- ওদের কাজই বন-বাদারির সাথে মিতালি করা । বন-বাদারি ছাড়া থাকতে পারে না ওরা । মনে হয় অক্সিজেন ফুরিয়ে এলো ।

- তাহলে ওরা আপনার এখানে এল কি করে ?

- দুদিন থেকেই দৌড় দেয় ।

অনুষা বললো,

ছেলেবেলায় রাশিয়ান একজন লেখকের বই পড়েছিলাম । বইয়ের নাম উভচর মানুষ । মানুষ অথচ পানিতে ডুবে থাকতে হয় । পানি ছাড়া থাকতে পারে না ।

- ঠিক বলেছেন । আমার বাড়ির লোকজন সে রকমি ।

অনুষা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

আমি একটু থেমে বললাম, আপনার বাবা-মা ভাইবোন ?

- আমার কোন ভাই বোন নেই । আমি একাই । বাবা-মা চিটাগং থাকেন । বাবা ব্যবসা করেন, জাহাজ আর টেলিকমের ব্যবসা । দাদার আমল থেকে চলে আসছে ব্যবসা ।

- তাহলে তো বাবাকে সাহায্য করলেই পারতেন মিস অনুষা ?

- বাবাও তাই চান কিন্তু নিজের বাবার ব্যবসায় কোন চ্যালেন্জ নেই । কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না ফলে শেখার কোন সুযোগ নেই হাসিব সাহেব ।

আমি বললাম, বাবা-মা আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারেন ?

- না পারেন না । সপ্তাহ না ঘুরতে মা এসে হাজির হয় আমার নারায়নগন্জের বাসায় । দুদিন থেকে চলে যায় । আবার আসে । যে সপ্তাহে মা আসতে পারে না, সে সপ্তাহে বাবা আসে । আমাকে নিয়ে ওদের একটা জ্বালা হয়েছে, এই বলে অনুষা অনেকক্ষণ হাসলো ।

- সেটা কিরকম ?

অনুষা হেসে বললো,

ওরা চায় আমি চিটাগাংয়ে সেটল করি । বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করি । এভাবে চাকরি নিয়ে শহরে শহরে ঘুরে বেড়ানো ওদের একদম পছন্দ না । কিন্তু আমার জিদের কাছে ওরা পেরে উঠে না । আমার অনেক জিদ হাসিব সাহেব ।

আমি হেসে দিলাম । কিছু বললাম না ।

দেখতে দেখতে প্যাকেট লান্চ এলো । কাগজের মোড়কে প্যাকেট লান্চ দিয়েছে ওরা । এক কোনে সাদা ভাত । এদিকে পড়ে আছে এক টুকরো মুরগির মাংস আর ডান দিকে শাকের-ভাজি । মাঝখানে দুই একটা শশা আর টমেটোর আশ ।

আমরা খেতে শুরু করেছি । তাকিয়ে দেখলাম অনুষা মুরগির মাংসটা এক পাশে সরিয়ে রেখে খেয়ে চলেছে ।

আমি বললাম, কি খাবেন না মুরগির মাংস ?

- না ।

- কেন বলুন তো ?

- সে কথা আরেকদিন বলবো, এই বলে অনুষা চুপ হয়ে গেল । আমি আর কথা বাড়ালাম না ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, এখানে কোথায় থাকেন ?

- টানবাজারের শেষ মাথায় আমার বাসা । ব্যাংক থেকে ভাড়া করা হয়েছে ব্যংক ম্যানেজারের জন্য । ইংরেজদের ফেলে যাওয়া বাসা বাড়ি । লালকুঠি বাড়ির নাম, একেবারে শীতলক্ষা লাগোয়ে । যে কেউ দেখিয়ে দিতে পারবে । আসুন না একদিন । আপনাকে শীতলক্ষার আলো হাওয়া দেখাতে পারবো ।

আমি বললাম, শীতলক্ষা লাগোয়া শুনেই লোভ হচ্ছে । নিশ্চয় রাতে নদীর তোড়জোড় শুনতে পান ?

- ঠিক ধরেছেন । মাঝে মাঝে নদী খুব অশান্ত হয়ে উঠে তারপর সেই শব্দ এসে ভর করে আমার সারা বাড়িতে । তারপর সেই শব্দের তালে তালে ঘুমিয়ে যাই । যখন ঘুম ভাঙে, দেখি কেমন শান্ত হয়ে গেছে নদীটা । সূয্যি মামা ধীরে ধীরে উঠে আসছে নদীর তলদেশ থেকে । ।

আমি বললাম, সেই আলোতে ভর করে নিশ্চয় গাংচিল গুলো পাখা মেলে ধরে ?

- ঠিক ধরেছেন । জানলেন কিভাবে এতসব ?

- মাঝে মাঝে সকাল বেলায় নদীর পাড়ে এসে দাঁড়াই । তখন দেখি গাংচিলগুলো সকালের আলোতে পাখা মেলে দিয়েছে ।

অনুষা হেসে দিল । নির্মল হাসি । বুঝলাম আমার কথা ভাল লেগেছে ওর ।

ISBN No. 978-983-43934-4-1

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

লালকুঠি

সেই সকাল থেকে ঝির ঝিরে বৃষ্টি । বিকেলের দিকে একটু কমে এলো । আবার শুরু হলো সন্ধ্যের পর থেকে । এ বৃষ্টি সহজে যাবে না । অনুষাকে কথা দিয়েছি ওর ওখানে রাতে ডিনার করবো । মাগরিবের নামাজ সেরে বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে । গায়ে মোটা জামা চাপিয়েছি । রাস্তায় নামতেই শীত এসে আকড়ে ধরলো ।

ছোটখাট এই নারায়নগন্জ শহর । সন্ধ্যে নামতেই কেমন ঝিমিয়ে যায় । তার উপরে বৃষ্টি এসে শহরের উত্তাপ কমিয়ে এনেছে । রাস্তায় খুব একটা লোক চোখে পড়লো না । সবাই ঘর দোর আটকিয়ে বাসা বাড়িতে বসে আছে । অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা রিকশা পাওয়া গেল ।

- কুঠি বাড়ি যাবেন?
- উঠেন ।

রিকশায় উঠে প্লাষ্টিক দিয়ে শরীর ঢেকে নিয়েছি । রিকশায়ালা মস্ত বড় টোপড় পড়েছে যেন বৃষ্টির পানি গায়ে না লাগে । টুংটাং শব্দ করে রিকশাটা ছেড়ে দিলো । হালকা আলো আঁধারির মধ্যে এগিয়ে চললো রিকশাটা ।

শহরের শেষ মাথায় আনুষার বাসা । আমার বাড়ি থেকে পনের মিনিটের পথ । ইংরেজ সাহেবদের ফেলে যাওয়া আস্ত কুঠি বাড়িটা ব্যাংক ভাড়া নিয়ছে ব্যাংক ম্যানেজারের জন্য । সেই বাড়িতে থাকে অনুষা । দাড়োয়ান, বাবুর্চি, আয়া সব দেয়া আছে ব্যাংক থেকে ।

বাড়ির সামনে এসে যখন থামলাম, তখন রাত আটটা বেজে গেছে । রিকশা ভাড়া চুকিয়ে দৌড়ে কুঠি বাড়ির বারান্দায় এসে দাড়ালাম । দোতলা বাড়ি । লাল রং করা । বাড়ির ছাদটা কাঠ দিয়ে চোঙা করে বানানো । বড় বড় কাঠের বারান্দা ঝুলে আছে দোতলার বারান্দা থেকে ।

- ম্যাডাম আছেন ? গেটে দাঁড়ানো দাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম ।

দাড়োয়ান দরজা মেলে ধরলো । ভেতরে যান । আপা আছেন ।

কাঠের বড় দরজাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম । মস্ত বড় ঘর । যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া । ব্রিটিশ বাবুদের কোন বড় সাহেবের ঘর হবে হয়তো । ঘরের দেয়াল লাল রং করা । বড় বড় কাঠের দরজা দেয়ালের সাথে সেটে আছে । লম্বা লম্বা হাতল ঘুরিয়ে সে সব খুলতে হয় ।

অনুষা এসে দাঁড়ালো । হেসে বললো,

বাড়ি খুঁজে পেতে কষ্ট হয় নি তো ?

আমি বললাম, রিকশায়ালাকে বলতে সোজা নিয়ে এলো । দেরি হয়ে গেলো কিছুটা আসতে ?

- ঠিক আছে । কোন অসুবিধে দেখছি না । বসুন ।

আমি বসে পড়লাম কাঠ আর বেতের চেয়ারে । উপরে তাকিয়ে দেখলাম একটা ঝাড় বাতি ঝুলে আছে ছাদের উপর থেকে ।

তারপর বলুন কেমন আছেন ?

আমি তাকিয়ে দেখলাম অনুষা আজ কালো পাড়ের সাদা শাড়ি পড়েছে । মাথার চুল আলতো করে ছেড়ে রেখেছে । সারা মুখে ছড়িয়ে আছে বুদ্ধির ছাপ । বড়সড় যে কোন ব্যাংক চালাতে অনুষার যে কষ্ট হবে না, ওর চোখের তারায় সে সব লেখা আছে ।

- ভালো আছি । আপনি ?

অনুষা বললো,

আপনার মতনি । ব্যাংক নিয়ে থাকি সারাদিন । এক সময় বিকেল হয়ে আসে । মাঝে মাঝে মনে হয় এই ব্যাংক নিয়ে থাকাটাই আমার কাজ ।

- আর কি কি মনে হয় ?

অনুষা হেসে দিলো । প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ।

আমি বললাম, আপনার বাড়িটা কিন্তু দারুণ । মনে হয় বড় কোন পাখি বাঁশ আর বেত দিয়ে বাসা বানিয়েছে ।

- বাড়ির কোন জায়গাটা আপনার ভালো লেগেছে হাসিব সাহেব ?

- বাড়ির মাথায় বাশ আর বেত দিয়ে যে অংশটা চোঙা হয়ে আছে, সেইটেই সবচেয়ে ভাল লেগেছে আমার ।

- চলুন, আপনাকে এর চেয়ে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যাই ।

অনুষার পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছি । হাঁটতে হাঁটতে সিড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম । কিছুদূর যেতেই ভারি পর্দা চোখে পড়লো । পর্দা সরিয়ে বাইরে পা রাখতেই আবাক হয়ে গেলাম । লম্বা একটা বারান্দা আড়াআড়ি ভাবে ঝুলে আছে । বারান্দার ছাদ টিন দিয়ে মোড়ানো । টিনের চালে নিরন্তর বৃষ্টি ঝরে চলেছে ।

- বসুন হাসিব সাহেব ।

বারান্দার মাঝে দুই তিনটে ইজি চেয়ার পাতা আছে । সেই চেয়ারে গা এলিয়ে বসলাম । সামনে এক ফালি বাগান । সেই বাগানের পরে শীতলক্ষা । শীতলক্ষার তোড়জোড় এসে কানে এসে ভর করলো ।

আমি বললাম, এ যে দারুণ এক জায়গায় । দিনভর এখানে বসে থাকলেও খারাপ লাগবে না ।

অনুষা হেসে বললো,

এই বাড়ির এই জায়গাটাই সবচেয়ে সুন্দর । অবসর পেলে এখানে এসে বসি । কখন যে বেলা পোরে আসে, সে খেয়াল থাকে না । নদীর তোড়জোড় দেখতে যে এতো ভাল লাগে, এখানে না বসলে জানা হতো না ।

- আপনি কি একা থাকতে পছন্দ করেন অনুষা ?

- ঠিক ধরেছেন । কিভাবে বুঝলেন ?

আমি হেসে বললো, আপনার সাথে আলাপ করে মনে হয়েছে, তাই বললাম ।

- আপনি এতো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ধরতে পারবেন আশা করি নি । । - হ্যাঁ, নিঃসঙ্গ থাকতে আমি পছন্দ করি । এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে এক ধরনের আমেজ আছে, এক ধরনের ভালো লাগা আছে ।

- সেটা কি মিস অনুষা ?

অনুষা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইলো । বললো, আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না । আমি নিজেও বুঝি না ।

- তাই বুঝি এখনো বিয়ে সাদি করেন নি ?

অনুষা হেসে দিল । অনেকক্ষণ হাসলো ও । হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন । এই একটি জায়গাতে আমার আপত্তি । বিয়ে সাদি করে এই নিঃসঙ্গতার ভালো লাগা থেকে বন্চিত হতে চাই নে ।

- আপনি কি একাই এই দলে?

- বলতে পারছি না হাসিব সাহেব । তবে শুনেছি অনেকেই এই নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নিয়েছে ।

আমি বললাম,

নিঃসঙ্গ জীবনের সাথে নদীর একটা সম্পর্ক আছে কারণ তাকে একা একাই বইতে হয় । তাই বুঝি শীতলক্ষার সাথে আপনার এতো মিতালি ।

- ঠিক ধরেছেন, এই বলে অনুষা হেসে দিল । আপনি খুব তাড়াতাড়ি আমাকে ধরতে পারেন । আপনার সিক্স সেনস খুব ভালো । আপনি চাইলে অনেক বড় হতে পারবেন ।

আমি বললাম,

ছেলেবেলায় একটা বই পড়েছিলাম । সেই বইয়ের নায়ক একবার সত্য সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে । অনেক সাধু সন্নাসির আশ্রমে সময় কাটে তার কিন্তু সত্যের সন্ধান মেলে না । অবশেষে সে নদীর কাছে সত্যের সন্ধান পায় । বয়ে যাওয়া নদী তাকে দেয় সত্যের ঠিকানা, এ বলে আমি থেমে গেলাম ।

- হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন হাসিব সাহেব ?

- আপনি যে শীতলক্ষার পাড়ে বসে থাকেন দিন ভর, তাই বললাম ।

অনুষা হেসে বললো,

আমি সত্য জানার জন্য বসে থাকি না নদীর পাড়ে । নদীর পাড়ে বসে থাকতে ভাল লাগে আমার । কোথায় যেন যোগসূত্র খুঁজে পাই নদীর সাথে । আমি আর নদী একাকার হয়ে যাই তখন । আমরা যে দুজনেই নিঃসঙ্গ, সেটা ভাগাভগি করে নেই ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না । চুপ হয়ে গেলাম । আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম অনুষাও চুপ হয়ে গেছে । ধীর স্থির ভাবে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে । নদীর সাথে মিতালি করছে ও ।

আমি নীরবতা ভেঙে বললাম, এই ছোটখাট শহরে একা থাকতে ভয় করে না ?

- না । কারণ আমার সাথে আছেন নসু চাচা । উনার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছি । যখনি আমার পোষ্টিং হয়েছে, নসু চাচাকে সাথে সাথে রেখেছি । কখনো বিয়ে সাদি করেননি নসু চাচা । জন্মের পর থেকে নসু চাচা কে দেখি আমাদের বাড়িতে । সেই থেকে নসু চাচা ।

- আপনার মতন নসু চাচাও বুঝি নিঃসঙ্গতা পছন্দ করেন ?

- ঠিক ধরেছেন । এই জায়গাতে আমাদের অনেক মিল ।

আমি হেসে বললাম, আর কতকাল একা থাকবেন ?

- জানি না হাসিব সাহেব । সত্যি সত্যি উত্তরটা আমার জানা নেই । তবে কাউকে নিয়ে থাকবো ভাবতে ভাল লাগে না । এই যে একা আছি, বেশ আছি । সারাদিন অফিস করে বারান্দায় এসে বসি । নসু চাচা এক কাপ কফি দিয়ে যায় । তারপর ধীরে ধীরে রাত নামে শীতলক্ষার পাড়ে । অন্ধকারে হারিয়ে যায় নদীটা । আপনার ভাগ্য খারাপ হাসিব সাহেব । আপনাকে নক্ষত্রের মেলা দেখাতে পারলাম না । অন্য দিন আসুন, আপনাকে নক্ষত্রের মেলা দেখাবো ।

আমি আর কথা বাড়ালাম না । তাকিয়ে দেখলাম শীতলক্ষায় বড় বড় জাহাজ সার্চ লাইট জ্বালিয়ে এগুচ্ছে । সেই সার্চ লাইটের আলো এসে পড়েছে বৃষ্টির গায়ে । ফলে বৃস্টির দানা গুলো ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো । এই শীতলক্ষার গভীরতা অনেক বেশি তাই বড় বড় জাহাজ অনায়সে ঢুকে পড়তে পারে ।

অনুষা বললো, এই বার বলুন আপনার কি পছন্দ ?

আমি বললাম, আমার কোন পছন্দ নেই তবে স্বপ্ন আছে ।

- বেশ বলুন শুনি ।

- শেষ বয়সে ময়মনসিংহ শহরের পাশ দিয়ে যে ব্রাক্ষ্মপুত্র গড়িয়ে গেছে, সেখানে ছোট্র একটা বাড়ি বানাবো । তারপর সেখানে কাটিয়ে দেব অবসর জীবনটা ।

- বাড়ি করবার জমাজমি কি কেনা হয়েছে ?

আমি বললাম,

ব্রক্ষ্মপুত্রের পাড়ে হাউজিং কোম্পানি গুলো প্লট বিক্রি করছে । আমি ব্যাংক লোন নিয়ে বড় দেখে একটা প্লটের অর্ডার দিয়েছি । বিঘা দুয়ের মতন । একেবার ব্রক্ষ্মপুত্র লাগোয়া ।

অনুষা অনেকক্ষণ চুপ হয়ে রইলো ।

- এত নদী থাকতে ব্রহ্মপুত্র বেছে নিলেন যে ?

- আমার মামার বাড়ি আছে ময়মনসিংহ শহরে একেবারে ব্রহ্মপুত্র ঘেষে । ছোট বেলায় অনেক গিয়েছি । ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে অনেক হেঁটেছি । কি যে সুন্দর নদীর গন্ধ আপনি না দেখলে বিশ্বেস করবেন না । এখন ঘুরে ফিরে সেই কথাই মনে পড়ে ।

- কি দিয়ে বাড়ি বানাবেন ?

- এখনো অতদুর ভাবি নি ।

- আপনাকে একটা সাজেশন দিই ?

- বলুন ।

অনুষা বলতে শুরু করলো,

দেয়াল আর ছাদ বানাবেন সিমেন্ট আর সুরকি দিয়ে কিন্তু ঘরের মেঝে হবে কাঠ আর বাশ মিলিয়ে । বাড়ির মাথাটা চোঙা করে দেবেন যেন মনে হয় পাখির বাসা । মস্ত করে বাড়ির বারান্দা বানাবেন যেন আলো হাওয়ায় ভরে যায় বারান্দাটা । যেদিন পূর্ণিমা উঠবে সেদিন বারান্দায় এসে বসবেন । পূর্ণিমা বিধৌত বিস্তৃত নদীর আলো এসে পড়বে আপনার পায়ের কাছে । বসে বসে সে সব দেখবেন আর কাথা মুড়ে বসে থাকবেন সারা পূর্ণিমা ভর ।

আমি হেসে বললাম,

আমার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন আপনি । এত সুন্দর প্ল্যান পাব আশা করিনি । আরো কোন সাজেশন থাকলে বলুন ।

অনুষা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, আর কি কি প্লান আপনার?

- আর একটা প্ল্যান হলো আমি একটু আগেভাগেই রিটাইরমেন্টে যাব যেন ব্রহ্মপুত্রের আলো হাওয়া অনেক দিন উপভোগ করতে পারি । সারাজীবন যদি টেবিলে মাথা গুজে বসে থাকি তো জগৎ দেখবো কবে ?

অনুষা কথা বললো না । বুঝলাম ও আমার কথায় যুক্তি খুঁজার চেষ্টা করছে ।

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাটা রাত নটায় ছুলো । ছোট্ট এই শহরে লোকজন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে । তার উপর বৃষ্টি এসে শহরের লোক চলাচল কমিয়ে এনেছে ।

অনুষা বললো, খেতে চলুন । খাবার দেয়া হয়েছে ।

চলুন ।

খেতে বসে দেখলাম টেবিল জুড়ে আছে হরেক রকমের শাক-সবজি, মাছ আর মাংস । সাদা ভাতের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো চারিপাশে ।

ভাত, মাছ শাকসবজি নিয়ে খেতে বসেছি । টেবিলের ওপাশে অনুষা বসেছে । অনুষার পাতে সাদা ভাত, ডাল আর শাক-সবজি ছাড়া কিছুই নেই । আস্তে আস্তে আমরা খেয়ে চলেছি ।

আমি বললাম, কৈ মাছ মাংস তো নিলেন না ?

অনুষা হেসে বললো, সে কথা পরে বলছি ।

আমি আর কথা বাড়ালাম । নিঃশব্দে খেতে লাগলাম । অনুষার চাপাচাপিতে সব কিছু একটু বেশি খাওয়া হলো । খাবারের শেষে পেপে, আম কেটে দিল অনুষা ।

অনুষা বললো, রাজশাহী থেকে এসেছে এই আম । গত সপ্তাহে বাবা দিয়ে গেছেন । একটু খেলেই বুঝতে পারবেন ।

আমি দেরি না করে পাতে তুলে নিলাম । তারপর বললাম, মাছ মাংস যে খেলেন না এর কারণ জানতে পারি কি ?

- নিশ্চয় পারেন তবে আপনার অনুমতি পেলে বলি ।

আমি হেসে বললাম, অনুমতি লাগবে না । আপনি বলুন ।

অনুষা বলতে লাগলো,

এই দেখুন না কেমন সুন্দর করে মাছ ভেজে আমার বয়-বেয়ারারা টেবিল সাজিয়েছে । বেচারা মাছগুলোর অবস্থা দেখে হাসি-কান্না দুই পায় । তাই ওসব ছুঁয়ে দেখি না ।

আমি বললাম, আপনি কি ঝলসে যাওয়া মাছগুলোর কথা বলছেন ?

- ঠিক তাই ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম, কিছু বললাম না । বসে বসে ভাবতে লাগলাম অনুষার কথা ।

অনুষা বলতে লাগলো,

এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবির মানুষ পশু পাখী ঝলসে খাওয়াকে ভাল চোখে দেখবে না । এই পশু পাখিদের শক্তি কম বলে আমরা সুযোগটা নেই । ওদের কেটে কাবাব করে খেয়ে ফেলি ।

অনুষার কথাটা আমার ভাল লাগলো । প্রতিবাদ করতে নিয়ে দেখলাম অনুষার পুরো কথাটাই ঠিক । আমরা চাইলে মাছ-মাংস না খেয়ে অন্য কিছু খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারি । এ পৃথীবি তো আমাদের একার না । মানুষ আর পশু-পাখি ভাগাভাগি করে নেবে এই পৃথীবি, সেটাই যৌক্তিক আর ন্যয়সঙ্গত ।

আমি বললাম,

আপনার কথায় কোন ফাঁক খুঁজে পাচ্ছি না । আমি জীবনে অনেক প্রাণী ঝলসে খেয়েছি । কখনো এ কথাগুলো মনে হয়নি । আজ খুব অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে । দেখবেন এ সব আর ছুঁয়ে দেখবো না ।

- সত্যি বলছেন ? এই বলে অনুষা প্রায় দাঁড়িয়ে গেল ।

আমি বললাম,

আপনি যে খাবারের মেনু থকে মাছ মাংস দূরে রেখেছেন, এর চেয়ে ভাল কাজ এর একটিও হতে পারে না । আপনাকে সাধুবাদ জানাই আমি ।

অনুষা বলতে লাগলো,

ইউরোপে আজকাল এ্যানিমাল রাইট নিয়ে কথা হচ্ছে । এমন একদিন আসবে যখন পশু প্রাণী নিধন নিষিদ্ধ করা হবে ।

- সেটা কবে নাগাদ হতে পারে মিস অনুষা ?

- সেদিন খুব দেড়ি নেই হাসিব সাহেব কিন্তু হয়ত আমরা দেখে যেতে পারবো না । আমাদের পরবর্তি প্রজন্ম পশু-পাখিদের সাথে সমানে সমান ভাগ করে নেবে এই পৃথীবি ।

আমি চুপ হয়ে গেলাম, মনে মনে অনুষার কথাগুলো ভাবতে লাগলাম ।

মাথায় একটা নুতন আইডিয়া এসেছে ? আমি দাঁড়িয়ে বললাম ।

- প্লিজ বলুন শুনি ।

- ব্রহ্মপুত্র লাগোয়া যে নূতন বাড়ি বানাবো, সে বাড়ির ছাদে পাখিদের জন্য বড় করে মাচা বানাবো যেন ওরা বাসা বাড়ি বানিয়ে থাকতে পারে । তারপর প্রতিদিন ধান চাল ছিটিয়ে দেব যেন ওরা পেট পুড়ে খেতে পারে ।

- কেন এইসব করতে চাইছেন?

আমি বললাম, আপনার কথা শুনে অনুশোচনা হয়েছে । ভাবছি শেষ বয়সে ওদের সেবা দিয়ে কাটিয়ে দেবো ।

- তাই, বলে খুশি হয়ে গেল অনুষা । আমার কথা ভাল লেগেছে ওর ।

- আরও প্ল্যান আছে শুনবেন ?

অনুষা আগ্রহ নিয়ে বললো, প্লিজ বলুন ।

- যেদিন পূর্ণিমা উঠবে, সেদিন নৌকা নিয়ে ব্রহ্মপুত্রে নেমে পড়বো । ভাবছি বাসায় মিস্ত্রী ডেকে স্পেশাল করে একটা নৌকা বানাবো কাঠ আর বাশ দিয়ে । মস্ত বড় ছই দেবো যেন বর্ষাকালে ছইয়ের ভেতরে বসে বৃষ্টি দেখতে পারি । তারপর পূর্ণিমার রাতে মাঝ নদীতে লঙর ফেলে বসে থাকবো রাতভর । নদীর ঝিরি ঝিরি বাতাসে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়বো তারপর সূয্যি মামা এসে ঘুম ভাঙাবে, এই বলে আমি তাকিয়ে দেখলাম অনুষা চুপ হয়ে আছে । খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে আমার কথা । একটু থেমে আমি বললাম, কেমন লাগলো প্ল্যান টা ?

- এর চেয়ে ভাল প্ল্যান আর একটিও হয় না হাসিব সাহেব । আমার তো লোভ হচ্ছে । শিশিরে শিশিরে নদীর বাতাসে ঘুরে বেড়ানো, এ তো হাজার বছরের স্বপ্ন । আপনি কিন্তু আপনার প্ল্যানটা চেন্জ করবেন না । যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে রাখবেন । আমাকে দাওয়াত করলে আমি গিয়ে দেখে আসবো আপনার কাঠের বাড়ি, উঠোন আর নৌকা ।

- আপনাকে আজই দাওয়াত দিলাম । আপনি আসবেন ।

দেখতে দেখতে রাত অনেক হলো । ঘড়ির কাটা রাত দশটা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ হলো । রিকশায় চড়ে বসেছি । এখান থেকে পনের মিনিট লাগবে বাসা পৌছতে । রিকশা ছুটে চলেছে উত্তরমুখী । রিকশায়ালা মাথায় মস্ত বড় টোপড় পড়েছে আর আমি হুড তুলে বসে আছি । রিকশাটা জোড়ে চলতে শুরু করলে ঠান্ডা বাতাস এসে গায়ে পড়লো । শীতলক্ষা থেকে উঠে আসছে এই শীতল হাওয়া ।

।। চতুর্থ অধ্যায় ।।

কায়ছার

- কখন এলে ? অনুষা বললো ।

- বিকেল চারটায় পৌঁছেছি । নসু চাচা বললো, তুমি অফিসে, ফিরতে দেরি হবে । তাই একটু হাত মুখ ধুয়ে ঘুমিয়ে নিলাম ।

- ভাল করেছো । মাঝে মাঝে ব্যাংকে অনেক কাজ পড়ে যায়, তখন আর ফিরতে পারি না । ফিরতে ফিরতে সেই রাত, তোমাকে ওরা চা টা দিয়েছে ?

- ঘন্টায় ঘন্টায় ওরা চা পানি দিচ্ছে । ওদের সেবা যত্নে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি । এতক্ষণ নসু চাচা ছিল । তুমি আসবার একটু আগে বেরিয়ে গেছে । নসু চাচা এখনও আগের মতনি আছে । যেমন লম্বা তেমনি চওড়া ।

- হ্যাঁ ঠিক ধরেছে । একদম বদলায়নি নসু চাচা । সেই শক্ত হাত, মাথা ভর্তি চুল । সময় গেলে মানুষের বয়স বাড়ে । নসু চাচার বয়স কোন এক জায়গায় এসে থমকে গেছে । কত বয়স নসু চাচার ? কায়ছার হেসে বললো, তুমি তো ভাল বলতে পারবে অনুষা ?

- বাবার মুখে শুনেছি ষাট । মা বলে এর চেয়েও বেশি ।

নসু চাচা কত বলেন ?

অনুষা হেসে বললো, নসু চাচাদের সময় কি কেউ বয়স লিখে রাখতো নাকি ? তুমি যে কি বল না কায়ছার ভাই ।

- যাই হোক, কবে ফিরে যাবে চিটাগাং ? আংকেল-আন্টি বসে থাকে কবে ফিরবে তাদের অনুষা ?

- তুমি, বাবা মা একটু বুঝাতে চেষ্টা করো কায়ছার ভাই । আমি লেখাপড়া শিখেছি কাজ করে খাবার জন্য । নিজে কিছু নেব, অন্যকে কিছু দেব ।

- সে কাজের জন্য তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাব নেই অনুষা । চাচার এত বড় ব্যবসা, সেটা দেখলেই পার ?

অনুষা হেসে বললো, নিজের বাবার ব্যবসায় কাজ শেখা যায় না । বাবা কে বলো আমি আসব তবে আরো কিছুদিন পর ।
কায়ছার কিছু বললো না । চুপ হয়ে গেল ।

চিটাগাংএ অনুষাদের ব্যবসা বাব-দাদার আমল থেকে । অনুষার বাবা অল্প বয়সে অনেক শিল্প-কারখানা গড়ে তুলেছেন । একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে তার সুনাম আছে সব জায়গায় । কায়ছার আর অনুষার বাবা অনেক ব্যবসায়ের পার্টনার, যৌথ ভাবে অনেক শিল্প-কারখানা করেছে ওরা । কায়ছার তার বাবাকে ব্যবসায় সাহায্য করে । আমেরিকা থেকে এমবিএ করে এসেছে কায়ছার, তারপর থেকে বাবার ব্যবসায় । অনুষার সাথে কায়ছারের পরিচয় ছেলেবেলা থেকে । ওদের বিয়ে হলে ভালো হতো । অনুষার বাবা-মার আগ্রহ আছে এ বিয়েতে কিন্তু অনুষার নিঃসঙ্গ থাকার ইচ্ছের কারণে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করতে পারেনি ওরা ।

কায়ছার বললো, দেখেছো কেমন শহর ঝিমিয়ে গেছে সন্ধ্যে হতেই ?
- এ যে ছোট্ট শহর কায়ছার ভাই । দুই এক রাস্তায় শহর শেষ । তুমি ঘন্টা খানেক ঘুরলেই পুরো শহরে দেখতে পাবে । কাল অফিস থেকে ফিরে তোমাকে নিয়ে বের হবো । পুরো শহরটা দেখাব তারপর তোমাকে নিয়ে যাব শীতলক্ষার পাড়ে ।
কায়ছার হেসে দিল । কিছু বললো না ।
অনুষা একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো,

এই শহরের কেন্দ্র বিন্দুতে আছে শীতলক্ষা নদী । যখন সারাটা শহর হাফিয়ে উঠে, তখন নদীর বাতাস শহরকে জিয়িয়ে রাখে ।
- তুমি ঘাটলায় যাও অনুষা ?
- হু । সময় সুযোগ হলে নসু চাচাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি । ঘন্টা খানেক নদীতে ঘুরে ফিরে আসি বাসায় । আমার বাসাটা কেমন লাগলো, তা তো বললে না ?
- সুন্দর । বেশ সুন্দর । তবে কেমন যেন নীরব আর ভূতুড়ে ।
- ঠিক ধরেছ । সবাই তাই বলে । তারপর বলো, চাচা-চাচী কেমন আছেন? তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ? বাবা বলছিলো তুমি নাকি ভাল ব্যবসা বোঝ । এরি মধ্যে নূতন নূতন ব্যবসা শুরু করেছে ।

- হু । বলতে পার । নূতন ধরনের ব্যবসা করার চেষ্টা করছি । ট্র্যাডিশনাল ব্যবসা করে আজকাল খুব একটা লাভ করা যায় না ।

অনুষা কথা ঘুরিয়ে বললো, নারায়নগন্জ আসবার আগে নিশ্চয় ঢাকা হয়ে এসেছো ?

কায়ছার হেসে বললো,

তোমাকে বলাই হয় নি । এবার ঢাকায় এসে একটা ফ্ল্যাট কিনে ফেললাম । আমি ঘুরতে গিয়েছিলাম ওদের ওখানে কিন্তু কেন জানি একটা ফ্ল্যাট পছন্দ হয়ে গেল । কিনে ফেললাম ঝটপট । বাবা কে জানানো হয়নি, তোমাকেই প্রথম জানালাম ।

- তাই, বলে অনুষা হেসে দিল । কোথায় কিনলে ?

- বারিধারায় । ছিম ছাম নিরিবিলি পরিবেশ ।

- অনেক বড় ?

- হ্যাঁ বলতে পার । চার বেড রুম । মস্ত বড় ড্রইং ডাইনিনগ । দুপাশে বারান্দা ঝুলিয়ে দেয়া আছে ।

অনুষা বললো, তাহলে তো দারুণ । কবে থেকে থাকতে শুরু করছো ?

- আমার থাকা হবে না কারণ আমি চিটাগাং এর লোক । আমার সব কিছু চিটাগাং এর সাথে জড়িয়ে ।

- তাহলে ফ্ল্যাট কিনলে যে ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে কায়ছার হেসে বললো, হাতটা একটু বাড়াও তো ?

- কেন কায়ছার ভাই ?

- আহা.....বাড়াও না ?

অনুষা হাত বাড়িয়ে দিল ।

কায়ছার পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে অনুষার হাতে দিল । এই হলো ফ্ল্যাটের চাবি, ফার্নিস এ্যাপারটমেন্ট । তুমি ঢাকা গেলে থাকতে পারবে ।

অনুষা অনেকক্ষণ চাবির দিকে তাকিয়ে রইলো । ঝকঝকে সোনালী রংয়ের চাবি । কার্নিশের পাশ থেকে আলো এসে পড়তেই ওগুলো ঝলমল করে উঠলো ।

অনুষা হেসে বললো,

তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কায়ছার ভাই কিন্তু আমার ঢাকায় যাওয়া পড়বে বলে মনে হয় না । যদি কখনো যাই তোমার কাছে চাবি চেয়ে নেব ।

- ঠিক আছে তবে এখন রেখে দাও তোমার কাছে ।

অনুষা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো, চাবিগুলো তোমাকে ফিরিয়ে দিলে কি তুমি রাগ করবে ?

কায়ছার চুপ হয়ে গেল তারপর মাথা নামিয়ে বললো, না ।

অনুষা কিছু বললো না । চাবির গোছাটা কায়ছারের হাতে তুলে দিল ।

দুজনেই চুপ হয়ে বসে আছে । কেউ কথা খুঁজে পাচ্ছে না কি বলবে । নীরবতা ভেঙে কায়ছার বললো,

- অনুষা ?

- বল ?

- চল । চিটাগাং ফিরে যাই । আমি তোমাকে নিতে এসেছি ।

অনুষা চুপ হয়ে গেল । তারপর বললো,

তুমি তো জান আমি একা থাকতে পছন্দ করি । প্লিজ আমাকে থাকতে দাও আমার মত করে । যদি কখনও ফিরে যাই, তোমাকে জানাব । কিছু মনে করলে কায়ছার ভাই ?

- না, মনে করবো কেন ? তুমি যেভাবে ভাল থাক, আমরা তাই চাইব । তুমি সুখি হও অনুষা ।

- ধন্যবাদ কায়ছার ভাই । তুমি আমাকে যতটুক বুঝ, আব্বা-মা সেটুকু বুঝতে চায় না । কিছুদিন পর পর ওরা এসে হাজির হয় ।

কায়ছার হেসে বললো,

চাচা-চাচীর দোষ কি আর বলো ? তুমি ওদের একমাত্র সন্তান । তোমার কাছে ওদের মন পড়ে তাকে । তাই ছুটে আসে ।

- আমি বুঝি কায়ছার ভাই । আমি ধরতে পারি তারপরেও আমার মনে হয় আমি বাইরে কিছুদিন কাজ করি যেন বাস্তবতা শিখতে পারি । ছেলেমেয়েদের এই ভাবে আগলে রাখলে আমরা তো বাস্তবতা শিখবো না । নিজের পায়ে দাঁড়ানোর শিক্ষা নেয়া চাই যেন বাবা-মা না থাকলে আমরা চলে খেতে পারি ।

কায়ছার হেসে দিল । কিছু বললো না ।

।। পন্চম অধ্যায় ।।

নদীর ঘাটলায়

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে এসেছি । আজ আর কাল ছুটি তাই হাঁটতে বেড়িয়েছি । ভেবেছিলাম ঢাকায় ফিরে যাবা জিগাতলার বাসায় কিন্তু বাবা-মা গেছেন দেশের বাড়িতে কদিনের জন্য । ওখানে নূতন গাছের খোঁজ পাওয়া গেছে । যেখানেই গাছ সেখানেই ওরা । এ যেন গাছপালার ভূত আমাদের জিগাতলার বাসায় আস্তানা গেড়েছে ।

শীতলক্ষার পাড়ে একটা রেস্টুরেন্ট খুলেছে ঢাকার এক কোম্পানি । একেবারে শীতলক্ষা লাগোয়ে । রেস্টুরেন্টে বসে নিচে কুলকুল শব্দ শোনা যায় । পুরোটা রেস্টুরেন্ট কাঠ আর বাঁশ দিয়ে বানিয়েছে ওরা । শক্ত মজবুত বাঁশের উপর দাঁড়িয়ে আছে রেস্টুরেন্টটা । বাইরে থেকে কেউ এলে এখানে এসে বসে । নদীর হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে আবার যাত্রা করে ।

রাতের ডিনার এখানে করবো সেই নিয়ত নিয়ে বসেছি । আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এলো নদীবক্ষে । ঘাটলায় জ্বালানো ল্যাম্প পোস্টের আলো এসে পড়ছে নদী পাড়ে । সেই আলোর দীর্ঘ ছায়া গিয়ে পড়লো নদীর গভীরে । তাকিয়ে দেখলাম নদীর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা লন্চ গুলো আলো জ্বালাতে শুরু করেছে । ওদের আলো ছায়া হয়ে দুলছে নদীর পানিতে । এদিকে বিশাল দুটো জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে । মনে হয় দু-দুটো পর্বত মাথা তুলে স্থির হয়ে আছে ।

একজন এসে বললো, স্যার, চা কফি কিছু দেবো?

- কফি দিন আর সেই সাথে বিস্কুট । আপনাদের রাতের খাবারের মেনু কি ?

সবই আছে স্যার । ভাত, মাছ, শাক-সবজি আর ডাল ।

ঠিক আছে । আপাতত কফি দিন ।

লোকটা চলে গেল । তাকিয়ে দেখলাম লোকটা হেঁটে যাচ্ছে আর সেই তালে তালে কাঠের পাটাতনটা কেঁপে উঠছে থেকে থেকে । ধীরে ধীরে দুই-একটা তারকা ফুটে উঠলো আর সেই আলো এসে পড়লো বাশ-কাঠের এই রেস্টুরেন্টে । রেস্টুরেন্টের এই জায়গাটা সম্পূর্ণ খোলা তাই সব কিছু নজরে আসে । নদীর তল থেকে উঠে আসছে নদীর হাওয়া ।

এই নারায়নগন্জ শহরে আমার অনেক স্মৃতি আছে । সেগুলো মনে ভর করতে লাগলো একে একে । আশা সিনেমা হলের পাশে মস্ত বড় একটা দালান আছে । লাল সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা দালানটা । দীর্ঘদিন অবেহেলায় পড়ে থেকে জং ধরে গেছে কিন্তু তারপরেও এর ভেতরে থাকবার লোকের অভাব নেই । এই বাড়িটা ঘিরেই আমার অনেক স্মৃতি । ছেলেবেলায় আমার মামাতো ভাইরা থাকতো এই বাড়িতে । বাড়ি বড় বলে বাড়ীর ছাদটা ছিল চওড়া আর প্রসস্ত । আমার সেই ছাদে গুড্ডি উড়াতাম । লম্বা ছাদ বলে গুড্ডি নিয়ে দৌড় দিতাম । পত পত করে উড়ে যেতো গুড্ডি গুলো ।

একবার বিকেল বেলায় গুড্ডি উড়াচ্ছিলাম । তখন আমি একদম ছোটটি । ক্লাস ফাইবে পড়ি বলে মনে হয় । আমার সাথে ছিল আমার দুই মামতো ভাই । সেদিন জোড়েশোরে বাতাস বইছিলো ফলে নিমিষেই গুড্ডিগুলো উড়ে গেল আকাশে । তারপর ধীরে ধীরে দূরত্ব বাড়তে লাগলো আমাদের মাঝে । আমরা সুতো ছাড়তে লাগলাম । কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা ছোট হয়ে এলো । তখন বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু । হঠাৎ আমাদের কানে গুন গুন শব্দ ভেসে আসতে লাগলো । শব্দটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে । কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল আকাশে এক ঝাক মৌমাছির পাল । তাকিয়ে দেখালম ওরা তেড়ে আসছে আমাদের দিকে । সম্ভবত আশে পাশে কেউ চাক ভেঙেছে আর সেই আক্রোশ গিয়ে পড়েছে আমাদের উপরে । এদিকে গুড্ডিটা একেবার আকাশের চূড়ায় । ওকে যে নামিয়ে এনে দৌড় দেবো, তার ফুরসৎ নেই । গুড্ডি ফেলেই দৌড় দিলাম । বাড়ীর ছাদটা অনেক বড় বলে সিড়ি ঘরে পৌঁছতে পৌঁছতে মৌমাছি এসে আকড়ে ধরলো । তারপর ঝটাপট হুল বসিয়ে চললো ওরা । কতগুলো মৌমাছি সার্ট-প্যান্টের ভেতরে ঢুকে পড়েছে । আমরা পড়ি-মড়ি করে নিচে চলে এলাম । মামা-মামি, আম্মা মিলে আমাদের জামা কাপড় ছাড়িয়ে মৌমাছি বের করে দিলো । ভন ভন করে ওরা উড়ে গেল মনের ঝাল মিটিয়ে । তাকিয়ে দেখলাম সারাটা গা চাকা-চাকা হয়ে ফুলে উঠেছে । দুদিন জ্বরে পড়ে রইলাম । তারপর কিছু দিন পরে ভুলে গেলাম সে কথা । আবার গুড্ডি উড়াতে লাগলাম ছাদে গিয়ে কিন্তু এর পরে আর কখনো মৌমাছির আক্রমনের মুখে পড়িনি । সেই প্রথম সেই শেষ । এখন মাঝে সাঝে সেই

মস্ত বাড়িটার পাশ দিয়ে যাই । মনে পড়ে সে সব কথা । ছেলেবেলার দিনগুলোই ভাল ছিল । খুব মিস করি সেই দিনগুলো কিন্তু কোন ভাবেই ঘুরিয়ে দেয়া যায় না ঘড়ির কাটা । সে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে ।

- কখন এলেন? কে যেন পাশ থেকে বলে উঠলো ।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম অনুষা । অনুষা রায়হান আমার ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে । তার পাশে পাহাড়ের মতন উচু হয়ে আছে নসু মিয়া । আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, এই তো কিছুক্ষণ হলো । আপনি ?
অনুষা হেসে বললো, এটাই তো আমার জায়গা, সপ্তাহে দুদিন হলেও আসি ।
আমি হেসে বললাম, তাহলে দেখছি আপনার জায়গা দখল করে বসে আছি ।
- আমার জায়গা বলছেন কেন? এটা তো হোটেলয়ালাদের, যাই হোক বসুন ।

আমরা বসে পড়লাম । নসু মিয়া দূরের এক টাবিলে গিয়ে বসলো ।
আমি বললাম, আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি ?
- বেশ তো করুন ।
- আমি রাতে ডিনার করবো এখানে । আপনার ব্যস্ততা না থাকলে আমার আতিথেয়তা নিলে খুশি হব । চলুন না এখানে ডিনার করি ।
অনুষা চুপ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ । তারপর বললো,

ঠিক আছে । আপনার কথাই রইলো । তবে আমাকে আপনার ব্রক্ষ্মপুত্র লাগোয়া বাড়ির গল্প বলতে হবে ।

- অবশ্যই বলবো । ধন্যবাদ দাওয়াতটা কবুল করার জন্য ।
নসু মিয়াকে ডাকলো অনুষা ।
- তুমি বাড়ি ফিরে যাও । ঘন্টাখানেক পরে গাড়ি পাঠিয়ে দিও । আমি রাতে ডিনার করে ফিরবো ।
নসু মিয়া কিছু বললো না । আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল ।
অনুষা বললো,

শেষ বয়সে আপনি যে ব্রক্ষ্মপুত্রের পাড়ে বাড়ি করবেন, সেইটের কথা প্রায়ই মনে পড়ে । এ এক অসম্ভব সুন্দর পরিকল্পনা । শেষ বয়সটা খুব ভাল যাবে আপনার ।

হেসে বললাম, আপনার কথাটাই যেন ঠিক হয় মিস অনুষা ।

অনুষা বলতে লাগলো,

রাত বিরেতে যখন ঘুম আসবে না, তখন বারান্দায় গিয়ে বসবেন । ব্রক্ষ্মপুত্রের হাওয়ায় দেখবেন ঠিক ঘুম চলে আসছে । তারপর ঘুমিয়ে যাবেন । ভোর বেলা সুর্যের আলো এসে আপনাকে জাগিয়ে দেবে । তারপর এক কাপ কফি নিয়ে বসবেন বারান্দায় । তখন সুর্যের আলোতে চিক চিক করতে থাকবে সারাটা ব্রক্ষ্মপুত্র ।

আমি হেসে বললাম,

বক্ষ্মপুত্রের পাড়ে বাড়ি করাটা সম্ভবত আপনারই বেশি ইচ্ছে আমার চেয়ে । হয়তো এতদিন মনে মনে ছিল কিন্তু কখনো বুঝতে পারেন নি । আমি বলাতে সেটা মনে পড়েছে ।

- ঠিক তাই, বলে অনুষা হেসে দিল । তারপর বললো,

মানুষের অনেক আজানা ইচ্ছে আছে যেগুলো মানুষ কখনো জানতে পারে না । সুপ্তভাবে থেকে যায় বছরের পর বছর । তারপর কেউ ধরিয়ে দিলে মনে পড়ে সে কথা ।

আমি হেসে দিলাম । তারপর বললাম,

আমি আরো একটা সুপ্ত ইচ্ছের কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে পারি যদি আপনি অনুমতি দেন ?

- অনুমতি দিলাম । বলুন কি সেটা ?

আমি বলতে লাগলাম,

আপনি যে একা থাকতে পছন্দ করেন, সেটা আপনার মনের কথা নয় । কাউকে ভাল লাগেনি বলে একাকী জীবন বেছে নিয়েছেন ।

অনুষা চুপ করে রইল অনেকক্ষণ । তারপর বললো,

আপনার কথাটা ঠিক কিনা সেটা ভেবে দেখবো । তবে একা থাকতে আমি পছন্দ করি কিন্তু কেন করি তার কারণ জানা নেই । সময় পেরুলে হয়তো জানা যাবে কারণটা ।

আমি হেসে বললাম, এর মানে হলো যদি কখনো নিজেকে চিনতে পারেন, তখন জানা যাবে কারণটা ?

- ঠিক তাই, এই বলে অনুষা হেসে দিল । নিজেকে চেনা গেলে কেন একা থাকতে চাইছি তার কারণটাও বেরিয়ে আসবে কিন্তু নিজেকে চেনা তো শক্ত কাজ ।

আমি বললাম,

একজন লেখক একবার বলেছিলেন, অনেক মানুষের ভেতর অনেক প্রতিভা ছিল, যা সে কখনো জানতে পারে নি । জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছে কিন্তু কোনদিকে তার প্রতিভা তা জানা হয় নি । হয়তো খেলাধুলাতেই তার প্রতিভা কিন্তু সে হয়েছে ডাক্টার ফলে সুপ্ত প্রতিভা সুপ্তই থেকে গেছে । এটা তখনি ঘটে, যখন মানুষ নিজেকে চিনতে না পারে ।

- নিজেকে চেনা মানে কি হাসিব সাহেব ?

আমি বললাম, এ তো জটিল ব্যাপার, উত্তরটা আমার জানা নেই ।

তারপরেও চেষ্টা করুন না ?

আমি মাথা নিচু রইলাম অনেকক্ষণ । তারপর ঘাড় তুলে দেখি অনুষা তাকিয়ে আছে আমার দিকে উত্তরটা শুনবার জন্য । বিপদে পড়ে গেলাম রীতিমত । তারপর সাহস করে বললাম,

- নিজেকে চেনা মানে আপনি যে নিজেকে চেনেন না সেইটে বুঝতে পারা ।

অনুষা খুশি হয়ে গেল । বুঝলাম উত্তরটা ওর মনঃপুত হয়েছে ।

একটু থেমে বললাম, এইবার আপনি বলুন নিজেকে চেনা মানে কি ?

- আপনি তো উত্তরটা দিলেনই ।

আমি বললাম,

নিজেকে চেনার অনেক ব্যাখা হতে পারে । নানাভাবে একে সজ্ঞায়িত করা যায় । এইবার আপনার ব্যাখাটা শুনতে চাইছি ।

অনুষা চুপ হয়ে গেল । বললো, উত্তরটা আমার জানা নেই তবে কখনো মনে হলে আপনাকে বলবো ।

অনুষার মতন করে বললাম, এখন যা মনে হয় বলুন । পরে না হয় আবার বললেন ।

অনুষা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ । তারপর বললো,

আমাদের শরীরের একটা গভীরতা আছে । এক পর্যায়ে এর তল পাওয়া যাবে কিন্তু নিজেকে চেনার সম্ভবত কোন তল নেই । এ এক অসীম তলহীন অবস্থা অথবা বলতে পারেন নিজেকে চেনা যখন শেষ হবে, তখনি সত্যি জিনিষটা জানা যাবে । নিজেকে চেনা আর সত্যকে জানা একই সূত্রে গাঁথা ।

আমি বললাম, নিজেকে চেনার উপায় কি মিস অনুষা ?

অনুষা আবারও চুপ হয়ে গেল । বললো,

নিজেকে চিনতে হলে নিজেকে দেখতে হবে বাইরে থেকে । নিজের ভেতর থেকে নয় । আপনার মন সর্বদাই বলবে তুমি ঠিক পথে আছে । তুমি যা করছ সবই সঠিক । আসলে এইটে একটা ভাওতা । আমাদের মন প্রায়শঃ আমাদের ভূল তথ্যটি দেয় ফলে আমরা ভূল কাজটি করি সবচেয়ে বেশি ।

আমি বললাম, আমাদের মন ভুল তথ্যটি দেয় কেন ?

- আমাদের মনের গঠনটাই সে রকম । মন আমাদের ভূল তথ্যটি দেবে আর আমাদের কাজ হলো সেটা শুধরে নেয়া ।

আমি বললাম, এর মানে আপনি সব সময় মনকে সন্দেহ করে চলেন ?

- এ ছাড়া নিজেকে চেনবার কোন উপায় নেই । মন যাই বলুক, সেটা চুল চেড়া বিশ্লেষন করে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ।

আমি বললাম, মনের গাঙ্গে ভাসিও না তরী .....

- ঠিক তাই, বলে অনুষা হেসে দিল, আমিও হাসলাম । তারপর কথা ঘুরিয়ে বললাম, বলুন কি খাবেন? এদের এখানে সবই আছে । ভাত মাছ তরি-তরকারি ।

- আপনি তো জানেন আমি মাছ মাংস খাই না । আমার জন্য সাদা ভাত, আলুর চপ আর ডালের অর্ডার দিন ।

আমি বললাম,

সেদিন আপনার কথা শুনবার পর আমিও মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি । পৃথীবির প্রাণীদের সাথে ভাগ করে নেবো এই পৃথীবি ।

অনুষা কিছু বললো না কিন্তু ওর মুখে ছড়িয়ে পড়লো হাসি । অন্তত আরো একজন মানুষ ওর দলে ভিড়েছে । তারপর বললো,

আপনার বাবা-মা গাছের বাড়ি বানিয়েছেন । আপনি না হয় পাখিদের বাড়ি বানালেন । ব্রক্ষ্মপুত্র পাড়ের সব পাখিরা আপনার বাসায় আশ্রয় নেবে ।

আমি হেসে বললাম, আপনার আইডিয়াটা দারুণ । আপনার কথাটাই রাখবো । আমি পাখিদের বাড়ি বানাবো ।

- কিভাবে বানাবেন ?

আমি একটু চুপ থেকে বললাম,

বাড়ীর সামনের জায়গাটা সিমেন্ট দিয়ে বড় করে উঠোন করবো । তারপর সেই উঠোনে ছড়িয়ে দেব খুদ আর ধানের গুড়ো । বড় বড় বাঁশের মাচা করে দেবো যেন ওরা এসে বিশ্রাম নিতে পারে । চাইলে বাসাও বানাতে পারবে ।

- আর আপনি বসে বসে সেই সব দেখবেন? এই বলে অনুষা হেসে দিল ।

- ঠিক তাই । পাখিদের বাড়ি বানাবো তা কখনো ভাবিনি । আপনার আইডিয়ার জন্য ধন্যবাদ । ব্রক্ষ্মপুত্রের আলো হাওয়া আর পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে শুনতে দিন পার করে দেব ।

- আপনার বাড়ির কি নাম দেবেন হাসিব সাহেব?

- কি হলে ভাল হয় ?

অনুষা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললো, ঠিক আছে । এই নামটা আমি ঠিক করে দেব । আমাকে কদিন সময় দিন ।

- কদিন কেন ? আপনি চাইলে এক যুগ সময় নিতে পারেন কারণ আমার বাড়ি বানানো এখনো অনেক দেরি আছে ।

দেখতে দেখতে খাবার চলে এলো । সাদা ভাত, মসুরের ঘন ডাল আর ফুলকফির ভাজা । এর সাথে এক প্লেট সালাদ কেটেছে ওরা । টমেটো, গাজর আর শসার সালাদ । তখন ঘড়ির কাটা রাত আটটা ছুঁয়েছে । এমনিতে একটু ক্ষুদা লেগে ছিল । নদীর হাওয়া আরো উসকে দিয়েছে ক্ষুদাটা ।

আমি বললাম, প্লিজ নিন ।

অনুষা হাত বাড়িয়ে আমার প্লেটে ভাত বাড়তে লাগলো ।

আমি বললাম, প্লিজ আপনি আগে নিন ।

আমি নিচ্ছি, এই বলে অনুষা সাদা ভাত আর সালাদ তুলে নিল ।

আমি বললাম, কাল তো ছুটিছাটা, কি করছেন সারাদিন ?

- কোন প্ল্যান নেই তবে ঘরবাড়ি গুছাবো । সারা সপ্তাহের ঘর বাড়ি গুছানো, কাপড় চোপড় ঠিক করা এই সব চলে ছুটির দিনগুলোতে । আপনাকে একটু সালাদ দেবো হাসিব সাহেব ?

আমি বললাম, দিন ।

সালাদ দিতে দিতে অনুষা বললো, এই সালাদ আমার সবচেয়ে প্রিয় । আপনাদের গাছের বাড়িতে টমেটো, গাজর আর শসার চাষ হয় না ?

- না, তা ঠিক হয় না । দুর্লভ প্রজাতির গাছ দিয়ে দাদা তার বাগান সাজিয়েছেন । অনেক গাছ আছে যা শুধু আমাদের বাড়িতেই পাবেন । অনেকে দেখতে আসে সে সব ।

- আপনার এই দাদা ভদ্রলোকের সাথে একদিন আলাপ করবো । কেমন ধরনের মানুষ উনি?

- বিদ্বান । পৃথীবির ইতিহাস বহুবার পড়া আছে । সন, তারিখ, মাস সহ বলে দিতে পারবে পৃথীবির ইতিহাস ।

- তাহলে আপনিও নিশ্চয় ইতিহাস বিশারদ ?

আমি হেসে বললাম,

আমি ব্যাংকার । ডেবিট ক্রেডিট ভাল বুঝি । এর বাইরে আমার জানা খুব কম । কথাটা সত্য হলেও আপনাকে বললাম ।

অনুষা হেসে দিল । কিছু বললো না ।

দেখতে দেখতে রাত আরো গভীর হলো । ঘড়ির কাটা দশটায় গিয়ে ঠেকেছে । ছোট্ট শহরের লোক চলাচল স্তিমিত হয়ে আসছে ধীরে ধীরে । রেস্টুরেন্ট লাগোয়া যে সব দোকানপাট ছিলো ওরা দোকানের ঝাপ ফেলে বাড়ি ফিরে গেছে । নদীতে যে দুই একটা যান চলাচল করছিল, তারা নঙর ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে । কিছুক্ষণ পরে অনুষার গাড়ি এসে হাজির হলো ।

অনুষা হেসে বললো, যদি অনুমতি দেন তো উঠি ?

- নিশ্চয় ।

- আপনার ইনভাইটেশনের জন্য ধন্যবাদ । খুব ভাল করেছে ওরা ।

- আপনাকেও ধন্যবাদ ।

অনুষা বললো, আপনাকে কি বাড়িতে ড্রপ দিতে পারি ?

- ধন্যবাদ । তার প্রয়োজন দেখছি না । দুই গলি পরে আমার বাসা । আমি হেটেই ফিরবো ।

- ঠিক আছে । শুভরাত্রি ।

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

লুসান

সুইজারল্যান্ড সরকারের বৃত্তি নিয়ে ট্রেনিং নিতে এসেছি লুসান ইউনিভার্সিটিতে । প্রায় এক বছরের ট্রেনিং । কিভাবে সহজ এবং দক্ষ ক্রেডিট ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, সে নিয়ে ট্রেনিং দেবে লুসান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকেরা ।

লেকের ধারে এই লুসান শহরটা । ছিম ছাম ভিড় ভাট্টা নেই । বিকেলে লেকের ধারে গিয়ে বসি । শত শত টুরিষ্ট এসে দাঁড়ায় এই লেকের পাড়ে । অনেকে আবার স্টিমারে ঘুরে বেড়ায় । আজ মাস খানেক হলো এসেছি । হোস্টেল, রেজিস্ট্রেশন, পথ ঘাট চিনতে চিনতে প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে গেলো । হোস্টেলের জন্য ছোট্র একটা কুকার কিনেছি যেন নিজে রেঁধে খেতে পারি । বাজার থেকে শাক-সবজি, ডাল আর চাল কিনে সেদ্ধ করি । সবচেয়ে ভাল লাগে বড় বড় টমোটোর সেদ্ধ । ক্লাস থেকে ফিরে প্রথম কাজ হলো রান্না করা তারপর ঘর বাড়ি গুছিয়ে খেতে বসা । মনে এসে ভর করে দেশের কথা, শীতলক্ষার কথা, বাবা-মা আর দাদার কথা ।

প্রায় দুই মাস পার হয়ে গেল । ট্রেনিং চলছে যথারীতি । খুব ভাল ট্রেনিং দিচ্ছে ওরা । ব্যাংকিক খাতের যে সব সমস্যা আছে সেগুলো খুব সুন্দর করে বলেন প্রফেসররা । সব ঠিক চলছে কিন্তু কেন জানি মন বসাতে পারছি না । লুসানের লেক ধরে হেঁটে গেলে মনে পড়ে শীতলক্ষার কথা । শহরের সুরুঙ্গের মধ্যে দিয়ে যখন ট্রেন সুর-সুর করে এগিয়ে চলে, তখন মনে হয় নারায়নগন্জের অলি-গলির কথা । যখন ঝির ঝির শব্দে বৃস্টি নেমে আসে, তখন শীতলক্ষা লাগোয়া অনুষা রায়হানের কথা মনে পড়ে । নিশ্চয় অনুষা এখন বারান্দায় বসে আছড়ে পড়া শীতলক্ষা দেখছে ।

এক গাদা এসাইন্টমেন্ট দিয়েছে প্রফের লারিক । সেই গুলো করছি । বেশ মজা করে পড়ান প্রফেসার লারিক, তাই সহজেই মনে থাকে সব কিছু । ক্লাসে এসে এমন একটা ভাব করেন যেন তিনি গাই-গল্প করতে এসেছেন । এর এক ফাঁকে পড়িয়ে গেলেন ।

বিকেলের ডাক এসেছে । বাংলাদেশের ডাক । একটানে খুলে ফেললাম । খুলেই দেখলাম অনুষার চিঠি । পাঁচ ছয় লাইনে চিঠি শেষ ।

নারায়নগন্জ

হাসিব সাহেব,

প্রথমে আমার শুভেচ্ছা নেবেন । আশা করি ঠিক ঠিক লুসানে পৌঁছে গেছেন । আপনার ডিপার্টমেন্টের ঠিকানায় চিঠি পাঠালাম । আশা করি পাবেন ।

নিঃসঙ্গ জীবনের চেয়ে ভাল কিছু আমার জানা নেই কিন্তু এর বিকল্প হয়তো আছে এবং তার সন্ধান আমি পেয়েছি । আপনি যে ব্রক্ষ্মপুত্র লাগোয়া বাড়ি করবার স্বপ্ন দেখেন, সেই স্বপ্নের অংশীদার হতে চাই । আপনার স্বপ্নটা আসলেই সুন্দর । ব্রক্ষ্মপুত্রের পাড় ঘেষে থাকবো এর চেয়ে ভাল কিছু আমি মনে আনতে পারছি না এই মুহুর্তে ।

কবে ফিরছেন ? কবে বানাবেন সেই বাড়ি ?

ইতি, অনুষা রায়হান

Please comment about the book to me: sayed.hossain@yahoo.com

Visit my personal website at: www.sayedhossain.com

April 25, 2009